আজকের কাগজ

তারিখ 04 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গ্রামাঞ্চলে আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ঃ প্রসংগ শিক্ষা

মযহারুল ইসলাম

কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর (১৯৯৩) আমার নিজ গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তুলনামূলকভাবে আমাদের সময়ের অবস্থা স্মরণ করে এখন গভীর মর্মবেদনা অনুভব করি। আমি যখন প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণ করি, তখন দু'মাইল দূরে একটি স্কুলে যেয়ে আমাকে পড়তে হয়েছিল। একেবারেই ছোট একটি বালক। প্রাইমারী স্কুল ছিল তখন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। অতঃপর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি একটি জুনিয়র স্কুলে আমার বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে, মাঝে করতোয়া নদী। খেয়া পার হয়ে যেতে হত। সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময় আমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের স্কুল ছিল শাহজাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আমার গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে-মাঝে করতোয়া নদীর খেয়া পারাপার। স্কুলটির কোন হোস্টেল ছিল না। ফলে খরার মৌসুমে হেঁটেই প্রতিদিন বারো মাইল অতিক্রম করতে হত। প্রতিদিন ভোর ৫-০০ টায় উঠে স্কুলের পথে রওনা হতাম, স্কুল শেষ করে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে কোনদিন রাত্রি ১১-০০ টা হয়ে যেত। তখন কোন পাকা রাস্তা ছিল না। নগরবাড়ি থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত উত্তর বাংলার যে রাস্তাটি এখন আছে, সেটি তখন কেবলমাত্র মাটির রাস্তা ছিল না, ধূলোয় ছিল জড়াজীর্ণ। বর্ষাকালে জায়গির থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। যে বাড়িতে থাকতাম সেখানে বাড়ির কৃষক-চাকরদের সঙ্গে একই বিছানায় থাকতে হত। মানুষকে অবহেলার জন্য একথা বলছি না। ছোট থেকেই পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটু আকর্ষণ ছিল বলেই এমন পরিবেশে খারাপ লাগত এবং লেখাপড়ার কোন অনুকূল আবহাওয়া সে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া ছিল দুরূহ। সেসব দিনের কথা মনে হলে কত কষ্ট করে যে আমরা লেখা-পড়া করেছি তার একটা করুণ চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমনি অবস্থার মধ্যেও সেদিনের সেই প্রতিযোগিতামূলক স্কুল শিক্ষায় ভাল করতে হত, না হলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। আমার সাম্প্রতিক গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে এবং গ্রামের কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একথা উপলব্ধি করতে শিখছে যে, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আরো একটি আশার বিষয় এই যে, আমার থানায় যে কয়টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, সেগুলোতে ক্রমে ক্রমে ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক হেড মাস্টার আমাকে একথা জানিয়েছেন যে, এখন বহু গ্রামেই মেয়েদের জন্য পৃথক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এই যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এখানে সরকারের কোন কৃতিত্ব নেই-না এরশাদ সরকারের, না বিএনপি সরকারের। সবগুলো স্কুল গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে অথবা কোন কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির একক উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। স্কুল গড়ে উঠবার পর যখন সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য যাওয়া হয়, তখনই শুরু হয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। স্কুলের অনুমোদনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্ত নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু যেসব বিদ্যালয় সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে সেগুলোর ব্যাপারেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যা গ্রামবাসীর নিকট কেবল যে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে তাই নয়, শিক্ষার অগ্রগতিকেও রুদ্ধ করে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু সেই বিরল ব্যতিক্রম শুধু ব্যতিক্রম মাত্র।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পবিত্র রাখবার দায়িত্ব যেমন জনগণের, তেমনি সরকারের। দীর্ঘদিন যাবৎ বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, জনগণ নয়, সরকারই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমাগত অপবিত্র করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলে সরকারের হাত খুব সম্প্রসারিত নয় বলেই সেখানে শিক্ষার পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনা মোটামুটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে যেমন, তেমনি খালেদা জিয়ার আমলেও সরকারী নির্লজ্জ দলীয়করণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমেই স্পর্শ করছে এবং পবিত্রতা নষ্ট করে শিক্ষাকে দূষিত করে তুলছে। শিক্ষার নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের বেলায় সরকারী দলীয়করণ নীতির প্রভাব বলয় কেবল এরশাদের সময়ই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল একথা এখন আর সত্য নয়। গ্রামাঞ্চলেও বিএনপি সরকারের তান্ডব দলীয়করণ এখন জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক টাউটগণ তাদের নোংরা হাত নিয়ে উপস্থিত। এখানে জনগণ অসহায়। যেমন অসহায় দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপকবৃন্দ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটি প্রথমেই মনে আসছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে এবং পরবর্তীকালে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে দলীয়করণের যে নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট। ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত এই উপাচার্য এবং রাজাকার কোষাধ্যক্ষ ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রতিকূলতা অস্বীকার করে জিয়াউর রহমানের নামে একটি ছাত্রাবাস এবং খালেদা জিয়ার নামে একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ বিবেকবান অধ্যাপকগণ প্রতিবাদ জানিয়েও সফলকাম হতে পারছেন না। খালেদা জিয়া এমন কোন মহীয়সী মহিলা নহেন যে তাঁর নামেই ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করতে হবে। জ্ঞানের রাজ্যের বা দেশের মহৎ কল্যাণে তাঁর এমন কোন অবদান নেই যে তিনি যথার্থই মহীয়সী হয়ে উঠেছেন। বিএনপি সরকার গণতন্ত্রকে

যেভাবে দলতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে তার পরিণতি এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রকে ক্রমে ক্রমে অসার ও অপবিত্র করে তুলছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দৃষ্টান্ত আমি আমার নিজের অঞ্চল শাহজাদপুরেও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যেসব বিদ্যালয়ে ও কলেজের বিএনপি সমর্থিত প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকের সংখ্যা অধিক, কেবলমাত্র সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে, বেশি পরিমাণে সরকারী অনুদান লাভ করছে। প্রশাসনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ এক্ষেত্রে প্রায় অসহায়। তিনি বা তাঁরা যদি এসব ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহলে বিএনপি'র গুন্ডা বাহিনী প্রয়োজনবোধে তাঁদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করবে না। এমন ঘটনা শাহজাদপুরে সম্প্রতি ঘটেছে। ব্যাপারটি যে কিরূপ গর্হিত, সেকথা ভাবতেও একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি শিহরিত হই, সন্ত্রস্ত হই। দলতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী নীতি যে কিরূপ ভয়াবহ পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে একথা রাষ্ট্রপতি এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন বুঝতে পারেননি। হয়ত এখন উপলব্ধি করছেন। দৃষ্টান্ত থেকে বিএনপি যে কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছে একথা তাঁদের প্রায় তিন বছরের শাসন আমলে প্রমাণিত হয়নি।

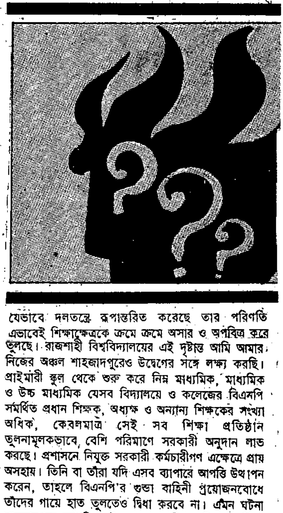

শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদন্ড গঠন করে। বিশ্বের যেসব দেশ আজ শিল্পায়নে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নত এবং অগ্রণী ভূমিকায় দন্ডায়মান, তাদের উন্নতির মূলে শিক্ষাই প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই সব দেশ অভ্রান্ত সত্যটি উপলব্ধি করেছিল যে, দেশের মূল শক্তি নির্মাণ করে দেশের মানুষ। অতএব দেশ গড়তে হলে দেশের মানুষকে প্রথম গড়তে হবে। মানুষকে গড়ার প্রধান এবং একমাত্র পথ শিক্ষা। এক সময় মানুষ বনে-জংগলে বাস করেছে। কিন্তু ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞান ও শিক্ষা সে প্রকৃতি থেকে, তার অভিজ্ঞতা থেকে এবং প্রয়োজনের তাগিদে অর্জন করেছে, সঞ্চয় করেছে এবং লালন করেছে। এভাবেই অন্ধকার থেকে মানুষ এসেছে আলোর দিকে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, অশিক্ষা থেকে শিক্ষার দিকে।

এই যে ক্রমাগত শিক্ষার অর্জন এবং লালন তার ফলেই মানব সভ্যতা ধীরে ধীরে নতুন নতুন সিঁড়ি ও ধাপ অতিক্রম করেছে। মানব সভ্যতা এভাবেই এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে পদার্পণ করেছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এক একটি মানবগোষ্ঠীকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন প্রতিযোগিতায় সেই সব মানবগোষ্ঠীই সভ্যতার স্তরগুলো পেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে যারা শিক্ষায় প্রদীপ্ত এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কালচক্রে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এমন প্রতিযোগিতায় আমাদের যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হয়, তাহলে শিক্ষাকেই হতে হবে আমাদের মূল অবলম্বন। অবলম্বনটিকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবলেই চলবে না, তার পবিত্রতাটিকেও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আমরা যদি এখনও একটি জাতি হিসেবে, একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসেবে সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে শুধু অন্ধকার হয়ে উঠবে তা নয়, আমরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে যাত্রা করব।

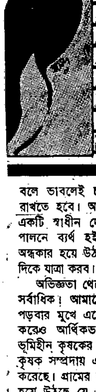

> বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছেন, সরকার যদি সেগুলো বর্জন করে শতকরা ৬০/৬৫ জন ঝরে পড়া বিশাল সংখ্যক যুবশক্তির কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা–ভাবনা করতেন এবং তাদের জন্য কর্মোপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন, তাহলে দেশের অনেক অধিক কল্যাণ সাধন করা হত বলে আমি মনে করি।

অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে তার মূল্য সর্বাধিক। আমাদের গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করেও আর্থিকভাবে টিকে থাকতে পারছেনা। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায় এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। গ্রামের বহু মানুষের মধ্যে ক্রমেই এই বোধ দৃঢ় হয়ে উঠছে যে, সে নিজে লেখাপড়া না শিখে যে ভুল করেছে সেই ভ্রান্তি যেন তার সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত না হয়। অতএব সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে হবে এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই গ্রামে গ্রামে আজ শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজন হয়ে পড়ছে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের। আমাদের শিল্পায়নের যে টুকু অগ্রগতি হয়েছে তার মূলে সরকারের ভূমিকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সরকার যদি কোন ভূমিকা পালন করে থাকে তবে সেই ভূমিকা যে সহায়ক ভূমিকা নয় আমি শত শত দৃষ্টান্ত থেকে তা প্রমাণ করতে পারি। সরকারের ভূমিকা যদি সত্যি কিছু থেকে থাকে তবে তা সহায়ক নয়, পুলিশী ভূমিকা। লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে একটি শিল্প গড়ে তুলবার পরেই সরকার চোখ রাঙানো খবরদারী করতে অগ্রসর হয়। খালেদা জিয়ার সরকার অতিরিক্ত আমলা নির্ভর হবার ফলে এই চোখ রাঙানো খবরদারী বেড়েছে ও শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে, শিল্পের বিকাশ ও লালনে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ভূমিকা-এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়। ফলে যেমন শিল্পের বিকাশে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগে একটি নিদারুণ সলজ্জ ও সশংক অবস্থা বিরাজমান, তেমনি অবস্থা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও। গ্রামে গ্রামে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ ও উৎসাহ বেড়েছে বর্তমান সরকারের এমন ভূমিকা তা ধ্বংস করে দিতে পারে বলে আমার আশংকা। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের অনেকেরই এই আশংকা মর্মান্তিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত। বর্তমান সরকার যদি এমন দৃষ্টিভংগি ও আচরণ পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যর্থতার ভারবোঝা ও গ্লানি সমগ্র জাতিকেই বইতে হবে। এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি আমাদের আশু কাম্য। জনগণের মধ্যে যে সাড়া জাগিয়েছে, সেই সাড়া সরকারের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক, এই কামনা করি।

আশংকার আরো একটি কারণ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খালেদা জিয়ার সরকার মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ও লালন হোক এমন শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ধর্মীয় শিক্ষার যে প্রয়োজন নেই সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের দেশে মাদ্রাসাশিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়, তার মূলে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ অধিক পরিমাণে ঘটে। একটি জাতির জন্য এই শিক্ষা অভিশাপময় হয়ে উঠতে বাধ্য। শিক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রবর্তন অবশ্য বংগবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছে। জিয়াউর রহমান ছিলেন-এর প্রথম সার্থক প্রবক্তা। এরশাদের আমলে একই ধারার অনুবর্তন চলেছিল। খালেদা জিয়ার আমলেও পুনরায় এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোন ক্রমেই উৎপাদনমুখী শিক্ষা বলা যায় না। অথচ আজকের যুগে উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সবচেয়ে কাম্য। শিক্ষায় এক দিকে যেমন মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন ও পরিপোষকতার প্রয়োজন, তেমনি যে শিক্ষা মানুষকে বিজ্ঞান মনোস্ক করে তোলে, তেমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আমাদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের জন্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই সত্যটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার যদি উপলব্ধি না করে, তবে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে।

শিক্ষা সম্পর্কিত বিবিধ জটিলতা, সমস্যা ও অসারতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু গ্রামাঞ্চলে আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকেই মূল প্রতিপাদ্য করে প্রাসংগিক বক্তব্য তুলে ধরেছি। প্রসংগত ঃ আমার আরো একট কথা খুব জরুরীভাবে বিবেচনার বিষয় বলে মনে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বহু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ বা অন্যবিধ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এইসব ঝরে পড়া বালক-বালিকার চেয়েও বড় সমস্যার সৃষ্টি করছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এসে যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অথবা অন্য কোন কারণে শিক্ষা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এদের সংখ্যা শতকরা ৬০/৬৫ জনের কম নয়। এই ঝরে পড়া বিশাল সংখ্যক যুবকদের সম্পর্কে আমরা যে উদাসীনতা প্রদর্শন করে আসছি, তা আমার নিকট ক্ষমাহীন বলে মনে হয়েছে। এদেরকে যোগ্য নাগরিক ও উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করবার দায়িত্ব জাতি হিসেবে আমরা পালন করছি না। কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করার যোগ্য করে এমন শিক্ষা, ইংরেজীতে যাকে বলে ভোকেশনাল এডুকেশন, তেমন একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় এই বিশাল সংখ্যক যুবক-যুবতীদের আকর্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সব দেশ শিল্পে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ উন্নত, সেসব দেশে এমন যুবশক্তি বেশ উৎপাদনমুখী শিক্ষায় টেনে এনেছে। আমরা এদিক থেকেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। যদিও একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সরকার এদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন বলেই প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ওপর জোর দিয়ে বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছেন, সরকার যদি সেগুলো বর্জন করে শতকরা ৬০/৬৫ জন ঝরে পড়া বিশাল সংখ্যক যুবশক্তির কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তাদের জন্য কর্মোপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন, তাহলে দেশের অনেক অধিক কল্যাণ সাধন করা হত বলে আমি মনে করি।

মযহারুল ইসলাম ঃ দেশে–বিদেশে ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত অনেকগুলো গ্রন্থের লেখক, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক মহা–পরিচালক, বাংলা একাডেমী, অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, হার্ভার্ড ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, কবি ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী।